প্রথম আলো

তারিখ ২4 AUG 2015

স্কুলশিক্ষা নিয়ে নতুন ভাবনার সময় এসেছে

শিক্ষা

আবুল মোমেন

দেশের সামগ্রিক শিক্ষাকে পরীক্ষামুখী মুখস্থবিদ্যার বৃত্ত থেকে কীভাবে বের করে প্রকৃত শিক্ষার বৃহৎ পরিসরে মুক্তি দেওয়া যায়, সেটাই আজ শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং শিক্ষা-সংশ্লিষ্ট সবার ভাবনার প্রধান বিষয় হওয়া উচিত। সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এমডিজি) অর্জনে—অন্তত শিক্ষার ক্ষেত্রে—সংখ্যাগত দিকটি গুরুত্বপূর্ণ ছিল এবং তাতে নিঃসন্দেহে আমরা ভালো করেছি। প্রাথমিক পর্যায়ে মেয়েশিশুসহ প্রায় শতভাগ শিশুর স্কুলে ভর্তি হওয়াটা বড় অর্জন। মাধ্যমিক পর্যায়ে ঝরে পড়ার হার বেশি হলেও গ্রামগঞ্জের বাস্তবতায় এটা কম কৃতিত্ব নয়। আর সব শিক্ষার্থীর জন্য বছরের প্রথম দিনে উৎসবের মাধ্যমে বিনা মূল্যে সব বই—প্রায় ৩২ কোটি বই—বিতরণ চমকপ্রদ ও বিস্ময়কর সাফল্য।

২০১৫ সালে এমডিজি শেষ হবে এবং তারপর শুরু হবে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা বা এসডিজি অর্জনের পর্ব। এই লক্ষ্য অর্জন আমাদের জন্য কঠিন হয়ে পড়তে পারে, যদি না গুণগত উন্নয়নের চ্যালেঞ্জগুলো সময়মতো অনুধাবন করে এখনই যথাযথ পদক্ষেপের কথা ভাবা না হয়। শিক্ষামন্ত্রীর আন্তরিকতা, সদিচ্ছা ও যোগ্যতা নিয়ে কারও প্রশ্ন নেই। তাঁর সঙ্গে কথা বলে মনে হয়েছে, প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষাটি দেশের গ্রামগঞ্জের দরিদ্র মানুষের (যাঁরা দেশের জনসংখ্যার গরিষ্ঠাংশ) সন্তানদের প্রাথমিক শিক্ষা সম্পন্ন করার বিষয়ে ইতিবাচক প্রণোদনার কাজ করেছে। মনে হয় তাঁর পর্যবেক্ষণটি বাস্তবতারই প্রতিফলন। কিন্তু মাঠপর্যায়ে কাজ করে প্রথম থেকেই যারা এই পরীক্ষা প্রচলনের যৌক্তিকতা ও সার্থকতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে, এটাই তাদের প্রশ্নের সদুত্তর কি না, সে বিষয়ে আমি সংশয় প্রকাশ করব। এডুকেশন ওয়াচের ২০১৪ সালের ১৯ আগস্ট প্রকাশিত প্রতিবেদন সেই সংশয়কে যথেষ্ট শক্ত ভিত্তি দেয়। এটা নিয়ে ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের ইমেরিটাস অধ্যাপক ও প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়ের বিশেষজ্ঞ মনজুর আহমদ, ১৯ আগস্ট *দ্য ডেইলি স্টার*-এ যে নিবন্ধ লিখেছেন, তা থেকে কয়েকটি পয়েন্ট তুলে ধরছি। প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষার মূল্যায়নভিত্তিক এই প্রতিবেদনে উল্লিখিত, মনজুর আহমদের ভাষায়, কয়েকটি মূল লক্ষণীয় বক্তব্য হলো, এ পরীক্ষা প্রবর্তনের ফলে ১. পরীক্ষাকেন্দ্রিক প্রশ্নোত্তর মুখস্থ করার প্রবণতা উৎসাহিত হচ্ছে, ২. স্কুলের বাইরে প্রাইভেট পড়ার ওপর নির্ভরতা বাড়ছে, ৩. গাইড বই মূল পাঠ্যবইকে ছাপিয়ে গুরুত্ব পাচ্ছে, ৪. ছাত্ররা নকল ও অনৈতিক আচরণে আকৃষ্ট হচ্ছে, ৫. এ পদ্ধতিতে শিক্ষার বৈষম্য বাড়ছে।

ওপরের পাঁচটি বক্তব্য নিয়ে বাস্তবতা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল কারও মনে সংশয় থাকার কথা নয়। যদি আরেকটু গভীরে গিয়ে এ পর্যায়ে শিক্ষার হালচাল সম্পর্কে জানতে চাই, তার জন্য প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের প্রতিবেদনই যথেষ্ট বলে মনে করি। সরকার কেন নিজেদেরই মাঠপর্যায়ের জরিপের প্রতিবেদন উপেক্ষা করছে, তা বোধগম্য নয়। মোটের ওপর এ দুই প্রতিবেদনের ওপর নির্ভর করে মনজুর আহমদ সমাপনী পরীক্ষার কারণেই সৃষ্ট প্রাথমিক শিক্ষার পাঁচটি গুরুতর উদ্বেগের বিষয় তুলে ধরেছেন। পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর খুঁজেছে এডুকেশন ওয়াচ—

১. পরীক্ষা কি প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনীর সুনির্দিষ্ট দক্ষতাগুলো পরিমাপ করতে পারে? প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের পর্যবেক্ষণেই দেখা যাচ্ছে, উচ্চ পাসের হারের বিপরীতে কেবল বাংলা ও গণিতে নির্দিষ্ট দক্ষতা অর্জনের হার মাত্র এক-চতুর্থাংশ। বাকি তিন-চতুর্থাংশের অর্জন নানা মাত্রায় অভীষ্ট লক্ষ্যমাত্রার নিচে। আমরা জানি, তার মধ্যে বেশ বড় অংশের অবস্থা হতাশাজনক।

২. এতে কি শিক্ষাদান ও গ্রহণ প্রক্রিয়ার উন্নতি ঘটে সামগ্রিকভাবে শিক্ষার মান বাড়ছে? না, এতে মুখস্থের প্রবণতা উৎসাহিত হচ্ছে, শিক্ষার্থীর বিষয় বোঝা এবং সৃজনশীলতা ও পাঠক্রমের মূল বিষয়গুলো অনুধাবন উপেক্ষিত হচ্ছে। তদুপরি চিন্তা ও যুক্তিচর্চা নিরুৎসাহিত হচ্ছে।

৩. এটা কি মানসম্পন্ন শিক্ষার আবশ্যিক উপাদান হিসেবে শ্রেণিকক্ষে ছাত্রের বুনিয়াদি মূল্যায়নের সহায়ক, সম্পূরক এবং এ প্রক্রিয়াকে উৎসাহিত করে? বুনিয়াদি মূল্যায়ন শিক্ষকের জন্য প্রাত্যহিক কাজ, যা সমাপনী পরীক্ষার মতো সামষ্টিক চূড়ান্ত মূল্যায়নের চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, সবাই মিলে এ পরীক্ষাটিকেই প্রাথমিক শিক্ষার এমন এক কেন্দ্রীয় নায়ক করে তোলা হয়েছে, যাতে অত্যুৎসাহী অভিভাবক, কোচিং ব্যবসায়ী এবং অযাচিত হস্তক্ষেপে সিদ্ধ গণমাধ্যম মিলে প্রায় প্রথম শ্রেণি থেকেই যেকোনো পরীক্ষাতেই নব্বইয়ের ঘরে নম্বর পাওয়াকেই লক্ষ্য বানিয়ে ছেড়েছে। অর্থাৎ অভিভাবক-শিক্ষকেরা মিলে ছাত্রদের শৈশব তছনছ করে দিচ্ছেন।

৪. এটা কি শিক্ষাব্যবস্থায় সমতা বজায় রেখে মান অর্জনে অবদান রাখছে? সংগত কারণেই যেসব অভিভাবক পাঁচসালা পরিকল্পনা নিয়ে (প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণি) সন্তানদের মডেল টেস্টের মুখস্থবিদ্যায় পারঙ্গম করে তুলতে পারেন, তারা বেশি ভালো করেছে। সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অপেক্ষাকৃত গরিব ঘরের ছাত্ররা বৈষম্যের শিকার হচ্ছে।

৫. এটা কি শিশুদের জন্য একটি উন্নয়নমুখী ও সহায়ক বাতাবরণ তৈরির গুরুত্বের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ? ম্যাজিক মান জিপিএ-৫ নিয়ে গণমাধ্যম, অভিভাবকসহ সমাজ, কোচিং ব্যবসায়ী শিক্ষকেরা মিলে যে প্রচারণার মায়াজাল সৃষ্টি করেছেন, তাতে যে অধিকাংশ শিক্ষার্থী তুলনায় কম নম্বর পায়, তাদের কল্পনাতীত সামাজিক ও মানসিক দুর্দশা আড়ালে থেকে যায়। আমাদের নিষ্ঠুর অসংবেদনশীল গণমাধ্যম ও অভিভাবক সমাজ শিশুমনের ব্যথা-বেদনা, সংকোচ-সংবেদনার কোনো খবরই রাখে না, তোয়াক্কা করে না।

> পরীক্ষা প্রকৃতিগতভাবে একটি প্রতিযোগিতা। জীবন প্রতিযোগিতাময় এবং এর জন্য প্রস্তুতির প্রয়োজনীয়তাও অনস্বীকার্য। কিন্তু মনে রাখতে হবে, মানবসমাজ গঠন এবং মানবসভ্যতার বিকাশে প্রতিযোগিতার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ ছিল সহযোগিতা

প্রাথমিক পর্ব হচ্ছে শিশুর শিক্ষার—জীবনব্যাপী শিক্ষা গ্রহণের—প্রস্তুতিকাল। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—এ হলো সংগ্রহ ও সঞ্চয়ের কাল। এটি কোনো কারণেই শিক্ষার্থীর কাছে ফল প্রত্যাশা করার সময় নয়। যা দেখার তা হলো, তার সংগ্রহ ও সঞ্চয়ের কাজটি বাধাহীনভাবে ঠিকঠাকমতো চলছে কি না, তার সংগ্রহ ও সঞ্চয়ের ভাঁড়ার মানসম্পন্ন সম্ভারে সমৃদ্ধ হয়ে চলছে কি না। পরীক্ষা কেবল বাধা নয়, তার ভূমিকা মুখ্য ও প্রধান হয়ে উঠলে শিক্ষার্থীর অগ্রগতি বাধাগ্রস্ত হবে। সাধে কি বিজ্ঞানী আইনস্টাইন একে নাইটমেয়ার বা দুঃস্বপ্ন আখ্যা দিয়েছেন! এখন পরীক্ষায় জিপিএ-৫ পাওয়াটুই শিক্ষার একমাত্র লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। চতুর্থ শ্রেণির শিক্ষার্থীরা সাক্ষ্য দিচ্ছে, কীভাবে বাবা-মা ও কোচিং শিক্ষকেরা জিপিএ-৫ পাওয়ার জন্য তাদের ওপর শারীরিক-মানসিক লাঞ্ছনাসহ জুলুম চালান। তাদের শৈশব হরণ করা হয়েছে।

পরীক্ষা প্রকৃতিগতভাবে একটি প্রতিযোগিতা। জীবন প্রতিযোগিতাময় এবং এর জন্য প্রস্তুতির প্রয়োজনীয়তাও অনস্বীকার্য। কিন্তু মনে রাখতে হবে, মানবসমাজ গঠন এবং মানবসভ্যতার বিকাশে প্রতিযোগিতার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ ছিল সহযোগিতা। মানুষের অগ্রগতিকে পাখির উড্ডয়নের সঙ্গে তুলনা করে বলা যায়, দুটি ডানার মতোই সহযোগিতা ও প্রতিযোগিতার ভূমিকা এখানে। কিন্তু কেবল প্রতিযোগিতার মানসিকতা নিয়ে বেড়ে উঠলে তাতে স্বার্থপরতা, হিংসা-বিদ্বেষ, অসহিষ্ণুতার বীজ নিয়েই বড় হবে শিশু। আর বৃহত্তর সমাজবাস্তবতায় প্রতিকূল পরিস্থিতিতে তার ভেতরে পরিপুষ্ট এসব বীজ শক্তি নিয়েই প্রকাশিত হবে। আমাদের সমাজে এটাই ঘটছে। মানবমনের এই গতিপ্রকৃতির সঙ্গে শিক্ষার সংশ্লিষ্টতা বুঝতে হলে শিক্ষা ও মানবজীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে যে ধারণা থাকা প্রয়োজন, দুর্ভাগ্যের বিষয়, তা বাস্তব জীবনে জয়ী হওয়ার জন্য মরিয়া ও মোহগ্রস্ত বিষয়বুদ্ধি-তাড়িত সমাজের নেই। অথচ হাতেনাতে এর প্রমাণ পাওয়া যায় উচ্চশিক্ষায় ভর্তি পরীক্ষার ফল বিপর্যয়ে। অধিক সংখ্যায় উত্তীর্ণ করাতে এবং উচ্চশিক্ষায় আসন দিতে কেবলই মান নামানোর নির্দেশনা আসে। তাতে প্রাথমিক-মাধ্যমিক-উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার পরিসংখ্যান চমকপ্রদ দেখায়, কিন্তু মান বিচারের সময় ধরা পড়ে যায় ফাঁক ও ফাঁকি। এভাবে আমরা শিক্ষার প্রকৃত লক্ষ্য অর্জন করতে পারব না এবং আরও রূঢ় বাস্তবতা হলো, দুর্নীতির মহামারিসহ সামাজিক অবক্ষয় ঠেকাতে পারব না, সব প্রতিষ্ঠানের অধোগতি ও অকার্যকরতার অবসান হবে না।

টানা ৪০ বছর ধরে শিশুর শিক্ষা ও মনোবিকাশের কাজ করার অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি, উত্তরোত্তর পরীক্ষার চাপ বাড়ছে এবং গত কয়েক বছরে তা শিশু-নিপীড়নের পর্যায়ে পৌঁছেছে। সবাইকে সতর্ক করে বলব, এর ফল জাতির জন্য ভালো হবে না। ধর্মান্ধতা, সন্ত্রাস ও মাদকের মতো অভিশাপ বাড়ার পেছনে অন্যতম কারণ শৈশবে মানবিক বিকাশের উপযুক্ত রসদের ঘাটতি। আর সমাজে অসহিষ্ণুতা, আত্মকেন্দ্রিকতা, ক্ষুদ্রতা, নিষ্ঠুরতা এবং শিশু-নারী-দরিদ্র ও প্রান্তিকজনের প্রতি উপযুক্ত সংবেদনশীলতার অভাবের যে সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে, তা থেকে পরিত্রাণ দূরের কথা, তা আরও প্রকট হয়ে উঠবে। দুর্নীতি ও অপরাধপ্রবণতা তো গলগ্রহের মতো সঙ্গী হয়ে রয়েছে।

সম্প্রতি মধ্যপ্রাচ্য ও উত্তর আফ্রিকার মুসলিম দেশে দেশে ইসলামি জঙ্গিদের উত্থান এবং তাদের হাতে মানবজাতির সাংস্কৃতিক সম্পদ যে ধ্বংস হচ্ছে, তার প্রেক্ষাপটে গত এপ্রিলে প্যারিসে ইউনেসকোর একটি বৈঠক হয়েছিল। আর সেই আলোচনার পটভূমিতে গত ৩১ জুলাই ও ১ আগস্ট ইতালির সংস্কৃতিমন্ত্রীর আহ্বানে মিলান এক্সপো ২০১৫-এর হলঘরে বসেছিল 'জনগণের মধ্যে সংলাপের উপকরণ হিসেবে সংস্কৃতি' শীর্ষক সম্মেলন। তাতে বিশ্বের ৮৫টা দেশের সংস্কৃতিমন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রী এবং উচ্চপর্যায়ের কর্মকর্তারা যোগ দিয়েছিলেন। আমন্ত্রণপত্রে গুরুত্ব দিয়ে বলা হয়েছে যে বর্তমান প্রেক্ষাপটে সংস্কৃতির ভূমিকা উত্তরোত্তর বাড়ছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর শেষ উপন্যাস *শেষের কবিতায়* লিখেছিলেন, কমলাহীরের পাথরটি হলো বিদ্যা আর তা থেকে যে আলো ঠিকরে বেরোয়, তা হলো সংস্কৃতি। আমরা বলতে বাধ্য হচ্ছি, পরীক্ষার আতিশয্য ও সামূহিক চাপে খোদ বিদ্যাই অনর্জিত থেকে যাচ্ছে, ফলে আজ শিক্ষিত (আদতে ডিগ্রিপ্রাপ্ত) মানুষের কর্ম ও চিন্তায় আলোর প্রকাশ ঘটে না।

কাজ শুরু করার কিছুদিনের মধ্যেই আমরা আশির দশকের গোড়া থেকে স্কুল চালু করে, খানিকটা রবীন্দ্রনাথের ভাবনার অনুসারে, বলে এসেছি যে শিক্ষার সঙ্গে সংস্কৃতিচর্চার সমন্বয় না হলে তা সার্থক হবে না। বলা প্রয়োজন, আমরা সংস্কৃতি বলতে গান-বাজনা-নাচ-নাট্য, অর্থাৎ কেবল কলাচর্চার কথা বলি না, সংস্কৃতি শব্দটির ব্যাপ্ত ও পুঙ্খানুপুঙ্খ তাৎপর্যসহ এর সমগ্রতায় ধরতে চাই। এভাবে চর্চা হলে শিশু সাহিত্যশিল্পে দক্ষতার পাশাপাশি সৃজনশীল প্রতিভা ও মানবিক গুণাবলি বিকাশের অবকাশ পাবে। আর শিশু সমৃদ্ধ মন নিয়ে বড় হলে তার প্রভাব সমাজে পড়বেই। তাতে দুর্নীতি, সন্ত্রাস, স্বার্থপরতা ও আত্মকেন্দ্রিকতা, নিষ্ঠুরতার মতো ক্ষুদ্রতা ও অমানবিকতার সংস্কৃতি ও গ্লানি থেকে আমরা মুক্ত হতে পারব। শিক্ষা নিয়ে—অন্তত স্কুল শিক্ষা নিয়ে—আমাদের নতুনভাবে ভাবার সময় এসেছে।

● আবুল মোমেন : কবি, প্রাবন্ধিক ও সাংবাদিক।